Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.64-71
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিমল করের ফাণুসের আয়ু: তীর্থপতির জীবনবৈচিত্র

শোভা সাঁতরা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Bimal Kar wrote not less in his fifty years long literary life. Out of those works the author has published his 'Upanayas Samagra' according to his own selection. In the novel 'Fanuser Ayu', the author shows the life of a lonely, neglected, depressed teenager, who develops more painful depression in his youth. His conception of life is meaningless, therefore unnecessary. During childhood, adolescence and adolescence, the foundation of a person's mind is formed, if there is any abnormality, if any hidden fear or suppressed anger is buried deep in the mind, it gradually takes root in life, in the form of a disorder that follows him throughout his life. In 'Fanuser Ayu' novel, we see Titu reaching his youth as a pilgrim to the unusual and unhealthy environment of his youth, isolated and drained, the currents of desire and desire flowing in crooked ways, without finding a natural channel.

Key Words: Bimal Kar, Relation, Character, adolescence, lonely.

মূল আলোচনা: একটি শিশু জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে, বাল্য-কৈশোর-যৌবনে পৌঁছায় জৈবিক নিয়মে কিন্তু তার মনোজগৎ এগোয় সম্পর্কের এক একটি ধাপে পা রেখে। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক, চার পাশের আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিবেশি কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক এ— মন সম্পর্কের গ্রন্থিগুলিই এগিয়ে নিয়ে চলে তার মনের বয়সকে। কিন্তু এই সম্পর্কগুলির মধ্যে যদি কোনো অস্বাভাবিকতা থাকে, যদি মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সম্পর্কগুলি সোপান না হয়ে সৃষ্টি করে এক শূন্যতা, তবে সমগ্র ব্যক্তিত্বের ভরকেন্দ্রই বিচলিত হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আমাদের বলে যে মানুষের বহির্জীবন, কর্মজীবন, যৌথ জীবন এবং যৌনজীবন সবই একই উৎস থেকে উৎসারিত। কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধি কালেই একটি মানুষের মনের ভিত তৈরি হয়ে যায়। যদি সেখানে কোন অস্বাভাবিকতা থেকে যায়, কোন গোপন নিহিত ভয় বা চাপা আক্রোশ সে জমিয়ে রাখে মনের গভীরে তবে তা ক্রমশ বাসা বাঁধে জীবনের মূলে, এক ব্যাধির রূপ নিয়ে তাকে অনুসরণ করে আজীবনকালে। ফাণুসের আয়ু উপন্যাসে আমরা দেখি তিতুর বয়ঃসন্ধিকালের অস্বাভাবিক ও অসুস্থ পরিবেশের জন্য তীর্থপতি তার যৌবনে পৌঁছেও বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত, তার ইচ্ছা ও আকাঙ্খার স্রোতগুলি স্বাভাবিক খাত খুঁজে না পেয়ে বাঁকা পথে, চোরাস্রোতে প্রবাহিত হয়।

তিতু শৈশবে মাতৃহীন হয়। তার স্মৃতির সঞ্চয়ে বাবা-মায়ের সম্পর্ক মালিন্যহীন নয়। তিতু তার শৈশবে বাবা হেম এবং মা সুষমার সম্পর্কের মধ্যে আনন্দ উজ্জ্বলতা পেতনা দেখেছে তিক্ততা বা ঘৃণা

দেখেছে তার চাইতে অনেকবেশি। কোনো কোনো রাতে জেগে উঠে পাশের ঘরে বাবা মায়ের ঝগড়ার আওয়াজ শুনতে পেত তিতু। চাপা, কিন্তু তীব্র হিসহিসে শব্দগুলি যেন চাবুকের মত আছড়ে পড়তো তার শরীরে। সব কথার মানে না বুঝলেও এক ব্যাখ্যাহীন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠত তিতুর শরীর। প্রতিবার কলহের পরই কিছুদিনের জন্য বাড়ির পরিস্থিতি শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হয়ে যেত। কিন্তু সেই ঝগড়া একবার আর থামল না। ঝড়ের আগে প্রকৃতির মত দিন কয়েক শ্বাসরুদ্ধকর গুমোট পরিস্থিতি চলার পর এক রাতে ঘটে যায় বিস্ফোরণ। তিতু শোনে—

> "বাবা বলেছে, বিয়ে করবার বেলায় আমি, আর ছেলে... ওই ধবধবে ফর্সা রোগা মতন ছেলেটা তোর পেটে...' তিতু আর শুনতে পেল না। মা যেন বাবার বুকের ওপর ঝাঁপ খেয়ে পায়ে পা জড়িয়ে ছিটকে পড়ল। ভারী একটা শব্দ। ছোট টেবিলের কোনায় লেগে সব উলটে পড়েছে। বাতি ভেঙে গেছে। নিভে গেছে। ও-ঘর অন্ধকার।
>
> তিতু ভয়ে কেঁদে উঠল। জোরে। ভীষণ জোরে। মা অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। 'জানোয়ার কোথাকার— ছোটলোক। মাতাল। শয়তান।'মা গলার আর শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে চিৎকার করছিল,'আমি ধরিয়ে দেবো তোমায়। পুলিশ তোমাদের ধরুক। দেখ আমি কি করি— মরবার আগে আমি এই নোংরামি...'তিতু কাঁদছিল। মা এ ঘরে এসে পড়ল। মা হাপাচ্ছে। কি গরম গা। হার থর থর করে কাঁপছে। যেন অনেক জ্বর মা'র। অনেক জ্বর।"[১]

তিতুর সেদিন মনে হয়েছিল মায়ের শরীরে অনেক জ্বর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুষমার মনের ভিতর কার অগ্নিৎপাতই তার শরীরের জ্বরের দাহ এনেছিল। দাম্পত্য সম্পর্কটি যে বহুদিন ধরে ধীরে ধীরে জতুগৃহে পরিণত হয়েছে তিতুর তা জানার বা বোঝার কথা নয়। পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙ্গে বাবার চিৎকারে। তিতু জেগে উঠে দেখে মা বিছানায় নেই, ঘরে নেই। শেষ পর্যন্ত বাইরে এসে দেখতে পায় বাগানের পেয়ারা গাছের ডালে দড়ি বেঁধে মা ঝুলছে।

ছ' বছরের তিতুর মনে নরম মাটিতে সেই রাতের তীব্র কলহ এবং পরদিন সকালে দেখা মায়ের ঝুলন্ত দেহের স্মৃতি একটি চিরস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। এক অব্যাখ্যাত ভয় যেন ওত পেতে থাকে তার মনের গোপন গহ্বরে— সুযোগ পেলেই লাফ দিয়ে উঠে তাকে গ্রাস করতে চায়। সেই সব মুহূর্তে তিতুর মনে হয় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে, এতটুকু বাতাসের জন্য ছটফট করে তার সমগ্র অন্তঃসত্তা। প্রিয়জনকে হারানোর ভয়ই একটি শিশুর মনের তীব্র উৎকণ্ঠরোধের জন্ম দেয়।

সমগ্র শৈশব কৈশোর জুড়ে তিতুর জীবনে মা-ই ছিল একমাত্র ভালবাসার মানুষ, তার অবলম্বন। ফলত, মায়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর এক ভীতি এবং উৎকণ্ঠার খোলস থাকে আবৃত করে রাখে সর্বসময়। এই সময় থেকেই তিতুর নিঃসঙ্গ—ঘরে এবং বাইরে। স্কুলে সে ক্লাসের ফার্স্ট বয় কিন্তু সেখানে তার কোন বন্ধু নেই। কৈশোরের স্বাভাবিক বহির্মুখীনতা তার স্বভাববিরুদ্ধ, নিজের সত্তার সঙ্গে একত্মা হয়ে থাকা অদৃশ্য খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে সে সকলের সঙ্গে কখনোই সহজে মিশতে পারে না। তার ভালো রেজাল্টের জন্যই হোক বা পোশাক-আশাকে চাকচিক্য এবং গাড়ি চড়ে স্কুলে আসার জন্যই হোক— সহপাঠীরা তার সম্পর্কে ঈসা বোধ করে। তিতুকে সবসময়েই কোন না কোন ভাবে উত্ত্যক্ত হতে হয়— কেউ পেন্সিলের খোঁচা মারে তো কেউ রুমালে থুতু ভর্তি করে দেয়। আবার কখনো বা দেখা যায় ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা,'তীর্থপতি মল্লিক, ছেলে নয় তো মেয়ে ঠিক'।পৃ-৫০ এইসব ঘটনায় তিতু দুঃখ পায়, অভিমান বোধ

করে--তবু বাড়িতে থাকার চাইতে তার স্কুলে যেতেই বেশি ভালো লাগে। কারণ এই নিষ্ঠুরতা এবং অপমানের মধ্যেও এক লুকানো স্বীকৃতি যেন সে খুঁজে পায়। যে স্বীকৃতিটুকু বাড়িতে কেউ তাকে দেয় না। মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা মাসিকে বিয়ে করেছে। পদোন্নতির জোয়ারে পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন কোয়ার্টারে উঠে এসেছে তারা। সাহেবি কায়দায় নতুন সংসার সাজিয়েছে মাসি----এই বাড়ির আসবাবপত্র নতুন। পুরনো এবং অব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে একটা কোনের ঘরে এবং সেই ঘরেই স্থান হয়েছে তিতুর।

"এই ঘরের সঙ্গে তিতুর ভাব নেই। তিতু ভালবাসে না কোন জিনিসটাই। মাসি তাকে যত খারাপ বিচ্ছিরিগুলো দিয়েছে। আর নিজে ভালো জিনিসগুলো নিয়েছে"। পৃ-১৬ মাসি ছিনিয়ে নিয়েছে তার বাবাকেও। মা বেঁচে থাকতে বাবার স্নেহ, আদর সে কখনো কখনো পেয়েছে...সে সবই এখন কেবল স্মৃতি।

"মা বলত, 'তিতু সোনা। লক্ষ্মী ছেলে।'
বাবাও তখন বলতো প্রায়, 'তিতুটার খুব বুদ্ধিশুদ্ধি হবে। ধারালো ছেলে।
বাবা এখন বলে, হোপলেস রটন। গাধা একটা।'
তিতুর কান্নাপায়। তিতু কাঁদে। তার ঘরে বসে।"[২]

মাসির স্নেহহীন। নিষ্ঠুর শাসনে তিতুর দিন কাটে আর মায়ের ছবি বালিশের তলায় নিয়ে রাত কাটে। মাসি কেবলমাত্র শাসনই করে না তিতুকে, প্রয়োজনে বিকৃত তথ্য দিয়ে বাবার মন বিষিয়ে দিতেও সমান সচেষ্টা। এক গ্রীষ্মের দিনে দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ সমস্ত আকাশ যেন ঘোলাটে হয়ে ওঠে, গাছপালা নিথর। আর তারপরেই ওঠে কালবৈশাখী। ঝড়ের আগে স্তব্ধ সময়টিতে তিতুর মনে পড়ে যায় ভয়ংকর সেই রাতের কথা—তার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে-আর তারপরেই যেন ঝড়ের হাতে আসে মুক্তির বার্তা। তিতু ঘর ছেড়ে ছুটে যায় বাগানে। ততক্ষণে শিলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে, মালির মেয়ে বিন্দুর সঙ্গে হুটোপুটি করে সে শিল কুড়িয়ে খায়। কিন্তু সেদিন রাতে খাবার টেবিলে বসে মাসি যখন বাবাকে বলে'... কি করেছে তোমার ছেলে জানো? নোংরা, বিশ্রী ব্যাপার। অগলি-! ওর স্বভাব চরিত্র এই বয়সেই নষ্ট হতে বসেছে। 'মাসি তিতুকে কে একনজর দেখে নিল,'বিকেলে বৃষ্টি পড়ছে তখন ও, তোমার ছেলে বিন্দুর ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। মেয়েটার সর্বাঙ্গ ভিজে-সব ভিজে। সমস্ত। কাপড় ছাড়ছে। তোমার ছেলে সেখানে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে।... দাঁড়াও, দাঁড়াও এতেও শেষ নয়; ওই মালির মেয়েটার বাটি থেকে মুঠো করে নিয়ে রাস্তার ধুলো-ময়লার শিল খাচ্ছে। পাশাপাশি বসে। আমি দেখলাম। পর্যন্ত লজ্জা করছিল।'[৩]

এই অভিযোগের সামনে তিতু যেন দিশেহারা হয়ে যায়। বিন্দুর সঙ্গে এক বাটি থেকে চিনি মেশানো মিষ্টি বরফ খেয়েছে সে ঠিকই-কিন্তু বাকিটুকু তো মিথ্যে! আর বাকিটুকু সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলেও তিতু অনুভব করে এর মধ্যে কদর্য কোন ইঙ্গিত লুকিয়ে রয়েছে। সেদিন বাবার মর্জিতে তাকে আরো বড় কোন শাস্তি পেতে না হলেও তিতুর অপাপবিদ্ধ মনটির উপর যেন একরাশ কালি ঢেলে দেয় মাসির বিষ মেশানো কথাগুলি।

এমনভাবেই বাল্য অতিক্রম করে কৈশরে পৌঁছায় তিতু। তার চারপাশে নিষেধের তর্জনী অদৃশ্য লোহার শিকের মতো গাথা হতে হতে থাকে। তিতু ভাবে একদিন সে এই খাঁচার মধ্যে সম্পূর্ণ বন্দী হয়ে যাবে-তার আগেই সে মুক্তি চায়। তার কাছে সেই মুক্তির উল্লাস প্রথম নিয়ে আসে বকুল। এক শরতের শিউলি ফোঁটা বিকেলে একটি ট্যাক্সি এসে থামে তাদের বাংলোর সামনে। ট্যাক্সি থেকে নামেন এক প্রৌঢ়। এবং

অল্পবয়সী একটি মেয়ে-তিতু তাদের আগে কখনো দেখেনি। আগন্তুকদের কথা শুনেই সে জানতে পারে এরা মাসির আত্মীয়-প্রৌঢ়া সম্পর্কে মামী হন মাসির। বাবা কিংবা মাসি বাড়িতে না থাকায় তিতু এদের নিজের ঘরে নিয়ে যায়। মেয়েটির নাম বকুল আর প্রৌঢ়া দিদিমা-দিদিমণি। দিদিমণি তিতুর চিবুক ধরে যখন সস্নেহে বলেন,'ওমা, তুই বুঝি সুষমার ছেলে।'[৪] কিংবা তাকে আদর করে ডাকেন,'তিতু সোনা'তখন তিতুর নিঃসঙ্গ ঊষর জীবনে একটুকরো মরুদ্যানের মতো মায়ের স্মৃতি আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

বকুল এবং দিদিমণি চলে যাওয়ার পর তিতু আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে,-সমস্ত বাড়ি জুড়ে যেন নিস্তব্ধতা গমগম করে। বকুল তিতুকে ঠাট্টা করে বলেছিল 'খাঁচার পাখি'-তিতু সেই বন্দিত্ব নতুন করে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারে। সে বকুলকে চিঠি লেখে আর ভাবে স্কুল শেষ করে সে যখন কলকাতার কলেজে ভর্তি হবে তখন এই খাঁচা থেকে মুক্তি মিলবে তার। তিতু আকুল হয়ে সেই দিনগুলোর প্রতীক্ষা করে।

উপন্যাসের প্রথম পর্বে তিতুর বিষন্ন, নিঃসঙ্গ জগতের সমান্তরালে তার বাবা, মা এবং মাসির ব্যক্তিগত জীবনচর্চার ও কিছু কিছু ছবি তুলে আনেন উপন্যাসিক বিমল কর-যা থেকে বোঝা যায় সুস্থতা বা স্বাভাবিকতা ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল এই মানুষগুলির জীবন থেকেও। তিতুর বাবা হেমের চরিত্র তিনটি রিপু অত্যন্ত প্রবল-ক্রোধ, কাম এবং ঈর্ষা। বলা যায় স্বাভাবিক মানুষের নীতিজ্ঞান, উচিত-অনুচিত বোধ সবকিছু ডুবে যেত এই প্রবল তাড়নায়। হয়তো এই প্রবলতার মধ্যে পৌরুষের খানিকটা বাহ্যিক প্রকাশ ও রয়েছে যাতে বশীভূত হয়েছিল সুষমা- তিতুর মা। কারখানার দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হয়ে হেম যখন হাসপাতালে ভর্তি তখন হাসপাতালেরই নার্স সুষমা কিছুদিন তার সেবা শুশ্রষা করেছিল। নিরবিচ্ছিন্ন সহচর্যে সুষমার প্রতি আকর্ষণ জন্মায় হেমের আর তারপর সে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলে সুষমার আসা-যাওয়া অনিয়মিত হয়ে যেতেই ক্রোধে এবং অসহিষ্ণুতায় ফেটে পড়ে হেম। এক রাতে সুষমাকে না দেখতে পেয়ে ঘুসি মেরে হাসপাতালের দুসারি কাচের জানালা ভেঙে দিয়ে হুলুস্তুলু বাধিয়ে দেয়। হেমের এই আচরণের জন্য সুষমা মুখে অসন্তোষ প্রকাশ করলে ও মনে মনে সাড়া না দিয়ে পারেনি। কিন্তু সে যাকে ভালোবাসার প্রবলতা ভেবেছিল তা হেমের মনের কোন অন্ধকার গুহা থেকে উঠে এসেছে-সুষমা সেদিন তা বোঝেনি এমনকি বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই হাসপাতালের চাকরিটাও ছেড়ে দিয়েছিল অকাতরে...ভেবেছিল হেম তার নির্ভরস্থল হতে পারে। তাদের বিয়ের বছরখানেকের মাথায় তিতুর জন্ম হয় আর তারপর থেকেই বিষিয়ে যেতে আরম্ভ করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক। সুষমা এতকাল হেমের ভালোবাসার উচ্ছ্বাস দেখে এসেছে...এবার চাঁদের উল্টো পিঠের মত তার ঈর্ষা এবং সন্দেহের ভয়ংকরতাকে দেখে। শিশু পুত্রের চেহারায় হেম নিজের কোন আদল খুঁজে পায় না-আর তাতেই তার ধারনা জন্মায় এ ছেলে তার নয়। হাসপাতালের ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে সুষমার সম্পর্কের সম্ভাব্য-অসম্ভব্য সূত্র খুঁজে বেড়াতে শুরু করে সে, ভুলে যায় নিজের প্রাকবিবাহের আচরণ। বরং তার ধারণা জন্মায় সুষমা অবৈধ সন্তানের জন্ম দেওয়া থেকে বাঁচতে তাকে ব্যবহার করেছে। এই অভিযোগ সুষমার পায়ের তলার মাটি যেন সরে যায়-সে কখনো ভেঙে পড়ে দুঃখে, কখনো ঝলসে ওঠে প্রতিবাদে। এমন ভাবে কেটে যায় বেশ কিছু বছর এবং হেম ও সুষমার সম্পর্ক প্রায় খাদের কিনারায় এসে পৌঁছায়। হয়তো তারা নিজেরাই একদিন গড়িয়ে পড়তো খাদে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শেষ ধাক্কাটি এল বাইরে থেকে। সুষমার খুড়তুত বোন তপতী টাইফয়েডের পর শরীর সারাতে দিদির কাছে এসেছিল বেড়াতে। দিদির সংসারে অশান্তির আঁচ সে টের পায়, তেমনি আভাস পায় জামাইবাবুর মনেরও। তপতী অত্যন্ত চতুর এবং হিসেবী-হেমের দুর্বলতার আভাস টুকু তার নিজের অনুকূলে

চালিত করতে এসে তৎপর হয়ে ওঠে। কিছুদিনের মধ্যেই হেমের বাঁধন ছাড়া কামনা যা একদিন সুষমাকে অবলম্বন করেছিল তা এখন তপতীর প্রতি তীব্রভাবে ধাবিত হয়। হেমের প্রশ্রয়ে তপতী উপেক্ষা করতে আরম্ভ করে দিদিকে। সুষমার অগোচরে ছিল না কিছুই তবু তিতুর জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজের ঘর বাঁচাবার। কিন্তু তপতী কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সুষমা হেমের পকেটে একটা চিঠি পায়...যাতে তপতীর সঙ্গে হেমের নিয়মিত যোগাযোগ এবং তার সন্তান সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। সুষমার ধৈর্যের বাঁধ এরপর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে এবং এক রাতে প্রবল এর পর সে আত্মহত্যা করে। সুষমার মৃত্যুর পর হেম বিনা বাধাই তপতী কে বিয়ে করে-তবে নিষ্কন্টক হয়ে নয়। তার এই দ্বিতীয় দাম্পত্যে একটিমাত্র কাঁটা হয়ে জেগে থাকে তিতু। কাঁটার মতোই হেম তাকে উপরে ফেলতে চায়, কিন্তু পারেনা-কারণ সে নিজে না মানতে চাইলেও পৃথিবীর চোখে তিতু তারই ছেলে। একদিকে মৃত দিদির ছায়া, অন্যদিকে সপত্নীপুত্র-প্রশ্ন জাগে এসব সত্বেও তপতী হেমের জীবনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এত তৎপর হয়েছিল কেন? বস্তুতপক্ষে, তা হেমের প্রতি ভালবাসা যতখানি, তার চাইতে ও বেশি মল্লিক সাহেবের বৃত্তের লোভ, তবে তপতী প্রথম থেকেই সুষমার মত ভুল করেনি। নিজের সুন্দর শরীরের প্রতি হেমের কামনাকে সে ইন্ধন দিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছে—কখনো অভ্যস্ত হতে দেয়নি। হেমের স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাও কখনো কখনো ফনা তুলতে চেয়েছে কিন্তু তপতী দক্ষ সাপুরের মতো বসে এনেছে তাকে—কখনো উপেক্ষা করেছে-যেন সবই মাতালের প্রলাপ। কখনো তিতুর সম্পর্কে অভিযোগ করে হেমের চিন্তাকে ভিন্ন পথে চালিত করেছে আবার কখনো বা লাস্যে, মোহে ভুলিয়েছে স্বামীকে। হেমের কামনার এবং ঈর্ষার যে আগুনে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সুষমা, তপতী তাকেই নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, আগুন নিয়ে মেতেছে ভয়ংকর খেলায়। আর এইসব খেলার শেষে হেম যখন তপতীর শরীরের লোভে অক্ষম, কাতর তখন তপতী যেন মনে মনে যুদ্ধ জয়ের আনন্দ উপভোগ করছে—

'তপতী খুশি হল। গর্ব বোধ করলো। যে জালে স্বামীকে বেঁধে ফেলতে চাইছিল তপতী, সেই জালে বাঁধা পড়েছে হেম।ফাঁদ পাতার আগে সামান্য সন্দেহ ছিল, এখন না ভয়, না দুশ্চিন্তা। তপতীর সুখের অনুভূতিটা এখন শত্রু জয়ের মতন। সামান্য যে নিষ্ঠুর, উগ্র, গর্বিত এবং খেয়ালী যা খুশি, যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে তপতী হেমকে বাধ্য করতে পারে সেই মর্জির আগুনে কয়লা জুড়িয়ে দিতে।'[৫]

তপতী এমন চতুরতার সঙ্গে, হিসেব করে যখন স্বামীকে নিজের মুঠোয় আনত এবং নিজের পারঙ্গমতায় নিজেই মুগ্ধ হতো মনে মনে—তখন সে কখনো ভেবে দেখেনি এমন অস্বাভাবিক সম্পর্ক কতদিন টিকতে পারে—নিজের শরীরকে বাজি রেখে দাম্পত্য সহবাসের নামে এমন জুয়া খেলাই বা কতদিন সম্ভব! অন্যদিকে হেম তপতীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেও কোন কোন রাতে তাদের দাম্পত্য যুগ্মশয্যায় অদৃশ্য উপস্থিত অনুভব করে হেম। তিতুর নিঃসঙ্গ, এক জীবনে যেমন, তেমনি তার বাবা এবং মাসির যুগ্ম জীবনের মাঝে ও যে অদৃশ্য, অগোচর কোনো ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল সে কথা বোঝা যায় উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে পৌঁছে।

উপন্যাসে দ্বিতীয় পর্বের নাম তীর্থপতি। এই নামকরণের মধ্যে জীবনের তথা ব্যক্তিত্বের পালাবদলের একটা ইঙ্গিত হয়তো রাখতে চান লেখক। তিতু চেয়েছিল তার চারপাশে অদৃশ্য পিঞ্জর ভাঙতে, সে স্বপ্ন দেখতো বড় হয়ে যখন সে কলকাতায় পড়তে যাবে তখন সেখানেই মিলবে তার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। দ্বিতীয় পর্বে দেখা যায় তীর্থপতি কলকাতা শহরেরই বাসিন্দা-এখানে একটা মেসে থেকে সে চাকরি করে। কিন্তু

তিতুর মতোই তীর্থপতির চারপাশে ধূ ধূ করে শূন্যতা। তিতুর জীবন শূন্য ছিল ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায়, কিন্তু তীর্থপতির এই শূন্যতা স্বনির্বাচিত। বাল্যে যে তিতু ছিল স্নেহের সান্নিধ্যে কাঙাল, সে তীর্থপতি যখন যৌবনে এসে পৌঁছয়, তখন সমস্ত সম্পর্কের বন্ধন সে নির্মম রূঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করে। তিতু চাইত সঙ্গ, তিতু চাইতো তার প্রতি অন্যের আকর্ষণ। আদর, স্নেহ, ভালোবাসা-ভালোবাসাই চাইত তিতু। তীর্থপতি বুঝেছে, এ চাওয়াটা ভালো নয়। সঙ্গ চাইলে সঙ্গী জোটে, বন্ধু, আত্মীয়, প্রেমিকা-তাও। এরা জীবনে শুধু জট পাকায়, বাঁধন বাঁধে-মুক্তিকে আগল দেয়। আসলে মুক্তি নেই। তুমি শুধু তোমার—অন্য কেউ তোমার ভাগীদার হলেই, কিছুটা তার হয়ে যায়। তাকে যদি কিছু দাও তবে তার হাতে তোমার বাঁধনের একটা দড়ি স্বেচ্ছায় তুলে দেওয়া তীর্থপতি তা দেবে না। সে মুক্তি চায় নিজের মতন করে, সে নিঃসঙ্গতা চায় আত্মরক্ষা করার জন্য।'[৬]

তীর্থপতি ভেবেছিল এই চূড়ান্ত নিঃসঙ্গ তাই তার কাঙ্খিত মুক্তি। কিন্তু সে বোঝেনি পারস্পরিক সম্পর্কের না থাকলে মানুষ অস্তিত্বহীন, পরিচয়হীন এক শূন্যতা মাত্র। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য উদ্মাদছাড়া অন্য কোন মানুষ এমনভাবে বাঁচতে পারেনা। অথচ তীর্থপতি জীবনের স্বাভাবিক ধর্মের বিরুদ্ধে চালিত করতে চায় নিজের জীবনকে। কলকাতার মেসে একটি ঘরে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন থেকে দূরে প্রায় স্বেচ্ছানিবাসনে কাটে তার জীবন। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ কেবল মাসান্তে একবার মানি অর্ডারের ফর্ম ভরার সময়টুকুতে।

তীর্থপতি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখলেও তার মেসের ঘরটিতে আলো, হাওয়া, বৃষ্টির মতই কখনো কখনো আসে বাইরের পৃথিবীর মানুষেরা। এক কাঁচা হলুদ রঙের রোদে ভরা সকালে মাসি আছে তার ঘরে, আর একদিন নীল সন্ধ্যায় আছি বকুল। মাসি তাকে বলে বাবার অসুস্থতার কথা। সেদিনের সেই মল্লিক সাহেব আর নেই, দোর্দণ্ডপ্রতাপ, বনশালী মানুষটির এখন বিকারগ্রস্ত এক বৃদ্ধ। হয়তো এমনই হওয়ার ছিল, বিশ্বাসহীন, আস্থাহীন, জীবনযাপনের মধ্যে এই বিকারগ্রস্ততার সমাধি সংগ্রহ চলছিল বহুদিন ধরে। মাসি যখন বাবাকে রাঁচির উদ্মাদ আশ্রমে পাঠানোর কথা বলে তখন তীর্থপতি প্রাণপণ চেষ্টা করে নির্বিকার থাকার, উপেক্ষা করার। কিন্তু একসময় অনুভব করে নিজের কাছেই অসহায় ভাবে সে হেরে যাচ্ছে। অবধারিত কে মেনে নেওয়ার মতো বাবার চিকিৎসার আর্থিক দায়ভার সে স্বীকার করে নেয়। তিতুর কাছে পরাভূত হয় তীর্থপতি।

'তীর্থপতি বুঝতে পারছিল সে হেরে গেছে। মাসির কাছে, সংসারের কাছেও সম্পর্কের কাছে। তিতু যদি না জন্মাতো, তার বাবা থাকত না, মা মরত না। মাসির শাসন আর ঘৃণা আর কুকুরের ছানার মতন বেঁচে উঠতে হত না। কিন্তু যে-মুহূর্তে জন্মেছে, সে মুহূর্ত থেকেই কোন ও জটিল সূত্রে ওদের সঙ্গে তার এক ক্লান্তিকর দুঃসহ বন্ধন। অত্যন্ত শক্ত। চাও না- চাও, তুমি এই গেলে জড়িয়ে পড়েছ।'[৭]

বকুল এসে যখন তাকে'তিতু বলে ডাকে, বলে'আমি বকুল'তখন'তীর্থপতি বিস্ময়ের একটা মাঠ পেরিয়ে অন্য বিস্ময়ের ফাঁকা ধূ ধূ তেপান্তরে এসে পড়ল'[৮] এই ডাক যেন শ্রুতির গোচর হয়ে ক্রমশ প্রবেশ করে তীর্থপতি সত্তার গভীরে, সেখানে খিলানে ও অলিন্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ডাক পৌঁছে যায় তার অনাহত কৈশোরে। মাঝের সময়টা যেন রিক্ত, প্রাণহীন, রোদজ্বলা এক প্রান্তরের মতো পড়ে থাকে দুজনের মাঝখানে। তীর্থপতি চায়না মধ্যের এই ব্যবধান টুকু ঘুচে যাক, তাই বকুলের কণ্ঠে উষ্ণতা, আন্তরিক ব্যবহার, পুরনো দিনের কথা-এই সব কিছুই নিষ্ঠুর ভাবে সে অবহেলা করতে চায়।

তীর্থপতি ভেবেছিল একমাত্র নিঃসঙ্গতাই মেলে বিশুদ্ধ মুক্তি এবং তাই তার প্রার্থিত। কিন্তু নিজের মনই হয়তো মানুষের কাছে সব চাইতে বড় প্রহেলিকা। এক বর্ষার সন্ধ্যায় নিমেষে পাওয়া মানুষের মতো ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সে পৌঁছে যায় বিবাহিত বকুলের সংসারে। বাড়িতে সেই সময় তার স্বামী না থাকলেও নিজের ছোট্ট ছেলেটিকে নিয়ে সহর্ষে অভ্যর্থনা জানায় বকুল। তীর্থপতি বকুলদের বাহুল্যহীন ঘরটিতে বসে খাটের পরিপাটি বিছানা, আলনার গোছানো জামা কাপড় দেখতে দেখতে, ছোট ছেলেটির আধো আধো কথা শুনতে শুনতে, বকুলের রান্না এবং শোবার ঘরের মাঝে বারবার যাতায়াত লক্ষ্য করতে করতে ভাবে,

> 'এরা প্রত্যেকটি এক সম্পূর্ণ তাকে সৃষ্টি করে তুলেছে। তীর্থপতির মনে হল, এই সম্পূর্ণতা বকুলদের সংসারের মধ্যেই রয়েছে—ওদের মিলিত সম্পর্কময় জীবনের মধ্যে। বিস্ময়ের কিছু আছে বই কী, তীর্থপতি মনে মনে নিজের বিস্ময়কে সমর্থন করে ভাবছিল, তিনটি প্রাণী এবং তাদের একইসঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়ে কী করে একটি জীবনের নকশা তৈরি হয়ে যায়। ওরা কোথায় বাঁচার সবটুকু পায়? কেমন করে?'[৯]

তীর্থপতি জানত সম্পর্ক মানেই বন্ধন,সেই বন্ধন শুধুই স্বাধিকারকে খর্ব করে, কিন্তু বকুলদের সংসারের মাঝে তুচ্ছ, সামান্য গার্হস্থ্য মজ্জায় সে সেই বন্ধনের মাঝে মুক্তিকে হঠাৎই যেন আবিষ্কার করে। তার স্মৃতির তলদেশ থেকে গভীর জলের গন্ধ মেখে উঠে আসে এক একটি ছবি-আসানসোলের অফিস বাংলোতে এসে ফ্রক পরা বকুল, সেই ধাঁধা খেলা, পাশাপাশি ঘুমানো, তারপর কলকাতার কলেজে পড়তে এসে বকুলের বন্ধুত্ব ও সহচর্য, একসঙ্গে বেড়ানো, ক্যারাম খেলা, হাসি গল্প। এ সবই ছিল তিতুর জগতে, কিন্তু তীর্থপতি নির্মমভাবে এই সমস্ত কিছুকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু আজ সে অনুভব করে জীবনের স্বাদহীন, বর্ণহীন সেই নিঃসঙ্গতা চোরাবালির মতো তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে চলেছে। শৈশবের সেই প্রবল শ্বাসরোধকারী ভয় এসে যেন আচ্ছন্ন করে তাকে। ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো সম্বল করার মতো সে হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরতে চায় বকুলকে।সম্বিত ফিরে পায় যখন, তখন দেখে বকুল আর্ত চিৎকারে তার হাত ছাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে ঘরের দিকে। একদিন তিতু ভালোবাসার জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, জীবন তার সেই ক্ষুধা মেটাইনি। আর একদিন তীর্থপতি ভেবেছিল নিঃসঙ্গতাই মুক্তি। কিন্তু সে দেখল তাতে তার সমগ্র অস্তিত্বটাই শূন্য হয়ে যায়। এই শূন্যতা থেকে উঠে আসতে বকুলের হাত ধরতে চেয়ে ব্যর্থহল সে। তবে তীর্থপতি কীসের জন্য বাঁচবে! সম্পর্ক কিংবা সম্পর্কহীনতার কোনটাই তো তাকে দেখালো না বেঁচে থাকার কোন পথ! তবে কীসের আশায়, কোন প্রার্থনায় বেঁচে থাকবে সে!

'তীর্থপতির আজ আর সন্দেহ নেই, জীবনের প্রথম কোষ গঠন থেকে মৃত্যু সব সময় জীবনকে দাবি করেছে। আমরা প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর হাতে-পায়ে ধরে আয়ু ধার করে চলেছি। কেন! কোন প্রয়োজনে? জীবন কিছু দেবে, মৃত্যু যা দেয় না।

জীবনে কি আছে আর মৃত্যুতে কি নেই—তীর্থপতি আর তা বুঝতে পারছে না। তার জীবন তাকে এক কপর্দক ও দেয়নি। মুক্তি না, ভালোবাসা নয়, শান্তি ও না।'[১০]

তীর্থপতি জীবনে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে জীবন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে প্রিয়তম হতে পারে। তীর্থপতি প্রায়ই স্বপ্ন দেখতো একটি ট্রেনের। সে ভাবতো এই ট্রেনটি তাকে নতুন কোন আলোকোজ্জ্বল জীবনে পৌঁছে দেবে। স্বপ্নের সেই ট্রেনটি বাস্তবেও আছে এবং চলে যায়, কিন্তু তীর্থপতির নিস্পন্দ দেহ পড়ে থাকে লাইনের ধারে।

তথ্যসূত্র:

১. ফাগুসের আয়ু, বিমল করের উপন্যাস সমগ্র(৪), বিমল কর, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১৬, পৃ. ২২।
২. তদেব, পৃ. ১৬।
৩. তদেব, পৃ. ২৭।
৪. তদেব, পৃ. ৫২।
৫. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭।
৬. তদেব, পৃ. ৮২-৮৩।
৭. তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭।
৮. তদেব, পৃ. ৭৪।
৯. তদেব, পৃ. ৯২।
১০. তদেব, পৃ. ৯৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. সুমনা দাস সুর, বিমল করের কথাসাহিত্যে সম্পর্কের শিল্পবিন্যাস, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪১৫, জানুয়ারি ২০০৯।